মুকুর

সৌমেন নাগ

প্রাপ্তিস্থান

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

[১]

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অসময়ের বৃষ্টি। একটা হালকা শীতের আমেজ। আকাশ জুড়ে যেন একটা লাজুক ভাব। খণ্ড খণ্ড মেঘ গুলি কি একটা করে ফেলেছি এমন একটা ভাব দেখিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার আলপনা দিয়ে চলেছে।

কালো পিচের রাস্তাটা এখানে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। বৃষ্টির জল এখানে ওখানে জমে আছে। খুব একটা গাড়ি এই রাস্তায় চলে না। যানবাহন বলতে অবশ্য রিকশা ও সাইকেল। মাঝে মধ্যে একটা দুটো ট্রাক আর কালে ভদ্রে অ্যাম্বাসেডর অথবা ফিয়েট।

সবকিছু চেনা। সবই পরিচিত। এই রাস্তা, এই আকাশ, এই মাঠ, এখানকার গাছ, মাটি ও বাতাস সবই তো কতদিনের জানা। সর্বত্রই এক নিবিড় আত্মীয়তা।

প্রকৃতি তিলে তিলে তার বৈচিত্রের যে পেখম মেলে, তার রূপান্তরের ভেদরেখা প্রতিদিনের অভ্যস্ত চোখের দর্পণে ধরা পড়ে না। তাই যা কিছু বর্তমান তাই যেন চিরন্তন সত্য বলে মনে হয়। অতীতের প্রকৃতিকে বর্তমানের মাঝে আনতে মন সাড়া দিতে চায় না।

বসুন্ধরার জীবনের সাথে অতীত কেন তাহলে বার বার এভাবে উঁকি দেয়? বর্তমান কেন অতীতের ভ্রূকুটিতে এইভাবে আত্মসমর্পণ করে? বৃষ্টি হবার আগে এই রাস্তাটা ছিল শুকনো ঠনঠনে। কই, বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় এখানে ওখানে জমে থাকা জলকে এড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে সে দৃশ্য তো আর মনে পড়ে না। রাস্তার বর্তমান চেহারাটাই সত্যি মনে হয়। বৃষ্টির আগে চাঁপা গাছের পাতাগুলো নিশ্চয়ই সদ্য স্নান সেরে আসা অষ্টাদশীর পেলবতায় এখন যেমন হাসছে তেমন ছিল না। কিন্তু তার সেই ধূসর ম্রিয়মান চেহারাটা তো এখন মনে পড়ে না। বর্তমানই মনের পর্দায় উঁকি দিয়ে চলে।

বসুন্ধরা মন থেকে অতীতের শিকড়কে উৎপাটিত করে বর্তমানের বীজ বপন করতে চাইলেও তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটছে না। অতীত সর্বগ্রাসী আগাছার মতন বসুন্ধরার মনের কর্ষণভূমিতে প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে।

দীর্ঘ কয়েক মাস পরে বসুন্ধরা এই পথ ধরে হেঁটে চলেছে। এ পথ তার অতি পরিচিত। সেই ছোটবেলা থেকে এ-পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। তখন অবশ্য এ-পথের এ রূপ ছিল না। মেঠো পথের উপর লাল সুরকি ছড়িয়ে দিয়ে এই রাস্তাটা করা হয়েছিল। বসুন্ধরা দিদুর হাত ধরে এই পথে হেঁটে প্রথম স্কুলে এসেছিল। বাড়ি থেকে বাজারে এসে ডানদিকে একটা মাঠের উপর দিয়ে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতন এই রাস্তা সোজা স্কুলের গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। পথের দুধারে লাগানো হয়েছিল কৃষ্ণচুড়া, আকাশমণী, চাঁপা আর নিম গাছ। তখনও তারা হাতের স্পর্শে বিনম্র ভঙ্গিতে নুইয়ে পড়ত। বসুন্ধরা ছোটো কচি হাতে তাদের নরম ডালগুলিকে টেনে নিতে পারত। কচি পাতার পেলব স্পর্শে এক মিষ্টি ঘ্রাণ পেত। আজকের এই যৌবনদীপ্ত গাছগুলির মধ্যে অতীতের কোনো চিহ্ন নেই। যেন ঘোষণা করেছে আমার আর অতীত কী? আমি যা আছি তাই আমার বর্তমান। অতীতে কে আমার ডাল ভেঙ্গে ছিল, কোন গবাদি পশু আমার মাথাকে মুড়ে খেয়েছিল সে ইতিবৃত্ত আমার শরীরে লেখা নেই। আমি আছি এটাই আমার পরিচয়। অনাগত দিনে কোনো কসাই ধাতব দাঁতের আঘাতে

আমাকে ভূমি থেকে উৎপাটিত করবে তা আমার ভাবনার বিষয় নয়। কারণ অস্তিত্বই যদি না থাকে তবে আমার ভাবনা কী?

বসুন্ধরা চাঁপা গাছটার পাশে এসে দাঁড়ায়। এ গাছটার সাথে তার এক আত্মীয়তার টান অনুভব করে। এই গাছটি তার দাদুর হাতে লাগানো। কত বয়স তখন বসুন্ধরার? কিছুটা দাদুর কোলে কিছুটা দাদুর হাত ধরে টলমলে পায়ে এসেছিল বসুন্ধরা। সেও তার ছোটো কচি হাতে চারা গাছের গোড়ায় মাটি দিয়েছিল। সারা মুখে কাদা মেখে দাদুর কোলে মুখ লুকিয়েছিল। দাদু তাকে কোলে তুলে নিয়ে পাঞ্জাবির কোনায় মুখের কাদাগুলো মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এই গাছটা তোর বোন, কী নাম রাখবি এর বলত?'

বসুন্ধরা বলেছিল 'হাসি'।

গাছটার নাম হয়েছিল হাসি চাঁপা।

বসুন্ধরা গাছটার গায়ে হাতে রাখে। ডাকে হাসি।

পঞ্চদশী তরুণী হাসির শরীরে সদ্য স্নানের মোহময়ী আবেশ। পেলব শরীর বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল যেমন পঞ্চদশীর সারা অঙ্গে মুক্তো ছড়ায় হাসি চাঁপার শরীর জুড়ে সেই মুক্তোর মালা। বসুন্ধরার স্পর্শে সে রোমাঞ্চিত হয়, তার ডাকে পাতাগুলো সাড়া দিতে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে।

কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল বসুন্ধরার হাতে। ওপরে তাকাল। কলি এসেছে পাতায় পাতায়। সারা শরীর জুড়ে চাপা হাসি।

বসুন্ধরা হাত বোলায় গাছের গায়ে। হঠাৎ এক পশলা জল ভিজিয়ে দেয় তাকে। বসুন্ধরা গভীর আয়ত চোখে চাঁপার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার গায়ে গালটা চেপে ধরে। মনে হয় গাছের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন তার হৃদপিণ্ড অনুভব করছে। বসুন্ধরার শরীর গাছের ভিজে শরীরে ভিজে যায়। হাসি চাঁপাকে আরো নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত সিক্ত করতে চায়।

চাঁপার গায়ে ঠোঁট লাগিয়ে বসুন্ধরা বলে, তুই আমার জন্য কাঁদছিস? তোর নাম তো হাসি চাঁপা। কোনো দুঃখই তো তোর গায়ে লাগে না। তবে দিদির ভাবনায় কাঁদবি কেন? তার থেকে তোর হাসি থেকে আমায় একটুকরো হাসি দে। আমি যে বহুদিন ধরে হাসতে ভুলে গেছি, হাসি চাঁপা।

এই গাছটার সাথে সে এক নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে। এর কারণ এটা নয় যে সে এর চারা রোপনের সময় এর মূল স্থাপনে তার কচি হাতে মাটি লেপে দিয়েছিল। তার জন্মের দু'বছর পর তার একটা বোনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দশদিনের মাথায় সে মারা যায়।

বসুন্ধরা তখন ডুয়ার্সের চা বাগানের কোয়ার্টাসে থাকে। বাবার সাথে গিয়েছিল হাসপাতালে, নামেই হাসপাতাল। আসলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একজনই ডাক্তার। ম্যালেরিয়া হলে তিনিই কুইনাইন দেন। দাঁতের ব্যথায় অ্যাসপিরিন। আবার গর্ভবতী মহিলার প্রসব কালে তিনিই একাধারে ধাত্রী ও নারী রোগ বিশেষজ্ঞ। বসুন্ধরা তখন দু বছরের শিশু। আলো আঁধারের আবছা দাগকাটার মতন তার মনের পর্দাতে সেই ছোটো বোনের কথা যদিও বা ভেসে ওঠে তা বোধহয় তার বোনকে সে দেখেছিল বলে নয়। এর কারণ মাঝে মধ্যে তার সেই বোনের কথা মায়ের কোল ঘেসে শুয়ে শুয়ে কল্পনার বুননে সেই ছোট্ট বোনটির একটা ছবি তার মনের পর্দায় উঁকি দিত। মাকে জিজ্ঞাসা করত, বোনটাকে মা কেন বাড়িতে নিয়ে এল না? নিয়ে এলে সে তার সব পুতুলগুলি এমন কি পুতির মালাগুলিকেও বোনকে দিয়ে দিত।

মা শুধু তার মাথাটাকে বুকের মাঝে চেপে ধরত। বলত, সে যে চাঁপা গাছে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

বসুন্ধরা মায়ের বুক থেকে মুখটাকে তুলে এনে বলত, আমি কেন চাঁপা ফুল হই না মা?

মা তাকে আরো নিবিড় করে বুকের ভিতর টেনে নিত, বলত ও কথা বলতে নেই সোনা। তুমি যে আমার বুকের চাঁপা। আমার দুঃখের বাগানের আনন্দের চাঁপা ফুল।

বসুন্ধরা বলত, তবে বনু কেন গাছের চাঁপা ফুল হয়ে গেল।

মায়ের চোখের জলের উষ্ণ স্পর্শ পেত বসুন্ধরা। চুপ করে মায়ের কথা শুনত। মা-বলত বনু ছিল ভগবানের চাঁপা ফুল। তাই সবার মনে আনন্দ দিতে ভগবান তাকে বাগানের চাঁপা ফুল করে দিয়েছেন। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম আমার এই মা মণিকে তুমি শুধু আমার ফুল করে দেও। তাই তো তুমি কেবল আমার মা-মণি।

সেই বয়সেই বসুন্ধরা মায়ের বুকের কান্নার আওয়াজ টের পেত। বুঝত মার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মার গলা জড়িয়ে নিজের তুলতুলে শরীরের কবোষ্ণ উত্তাপে মার শরীরের সেই অব্যক্ত কান্নার ঢেউকে শুষে নিতে চাইত।

সেই চাঁপা গাছের চারাটা যখন দাদু এসে এখানে পুতেছিল, তখন বসুন্ধরা যেন তার সেই চাঁপা ফুল হয়ে যাওয়া বোনকেই কচি হাতের মুঠোয় ধরতে চেয়েছিল। দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই গাছের মধ্যেই তো আমার চাঁপা ফুল বোন ঘুমিয়ে আছে না দাদু?

দাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস চারাগাছের কচি পাতাগুলিকে আন্দোলিত করেছিল। বলেছিলেন হ্যাঁ, দিদি, একে যত্ন করো। এই গাছের ডালেই তোমার বোন জেগে উঠবে।

চাঁপা গাছের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সেদিন থেকেই স্থাপিত হয়েছিল। স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন বোতলে করে আনা জল ঢালত। কানাকেই দিয়ে চারিপাশে কঞ্চির বেড়া দিয়েছিল। অন্য গাছগুলির প্রায় সবকটা মরে গেলেও চাঁপা গাছটা বেশ তরতর করে তার ডালপালা প্রসারিত করে কয়েক মাসের মধ্যেই কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল।

কেটে গেছে একে একে একুশটা বসন্ত। মৃত্যু কি বসুন্ধরা জেনে গেছে। জীবনের বসন্তের বাগানে শকুনের কর্কশ ধ্বনি যে কালের নিয়মের গণ্ডিতে বাধা সেই চরম সত্যটিও তার জানা হয়ে গেছে। তবু শৈশবের সেই চাঁপা গাছ তার চাঁপা ফুল হয়ে যাওয়া বোনই থেকে গেছে।

বাড়ি থেকে যে রাস্তাটা একটু বাঁদিকে বেঁকে বেশ কিছুটা সোজা হয়ে চলে গিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে তার পূর্বদিক বরাবর চলে গেলে পড়ে বেলতলা। এখান থেকে একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে। আরেকটা রাস্তা খানিকটা পশ্চিমে গিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এরই ডান পাশ দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে স্কুলের গেটে।

জায়গাটার নাম বেলতলা। অথচ কোনো বেলগাছ নেই। তবে একসময় ছিল। তখন বুলবুল চণ্ডি আজকের মতন আধা শহর ছিল না। ছিল একেবারেই অজ গ্রাম। গ্রামের জমিদার বলতে যা বোঝায় সে রকম কোনো বড় জমিদারও এই গ্রামে কেউ ছিল না। তবে বসুন্ধরার দাদু সতীনাথ সামন্তই ছিলেন এই গ্রামের জমিদার। তখনও ল্যান্ড সিলিং হয় নি। নিজের নামে শ দুয়েক বিঘা ধানী জমি ছাড়াও গোটা ছয়েক পুকুর ও মাঝারি আকারের দুটি আমবাগান আর চাষের বলদ ছাড়াও ডজন খানেক গরু ইত্যাদি নিয়ে তিনিই ছিলেন গ্রামের ধনীতম ব্যক্তি।

সামন্ত বাড়ি অবশ্য নিছক গ্রামের বাড়ির মতন মাটির বাড়ি ছিল না। দু বিঘা জমির মাঝখানে দ্বিতল বাড়ি। ওপর নীচে মিলে চৌদ্দটি ঘর। সামনে নানা বাহারী ফুলের গাছ। পেছনে নারকেল, সুপারী, বাতাবিলেবু, পেয়ারা ও জামরুলের বাগান। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই ঠাকুর দালান। দেবোত্তর সম্পত্তি। কাছে কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে বয়ে চলেছে ট্যাঙ্গন নদী। বর্ষায় দুর্দমনীয়। শীত ও গ্রীষ্মে সূতিকাগ্রস্ত রমণীর মতন কোনো মতে জীবনের স্পন্দনকে বজায় রাখে।

বেলগাছ থাকলেই যে জায়গাটির নাম বেলতলা হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তবু এর নাম যে বেলতলা হয়েছে তার পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

গ্রামের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বেলগাছটা আপনা থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। গাছটা কত বছরের পুরানো সেই কথা কেউ মাথায় আনে নি। গ্রামে বেলগাছ তো কতই আছে। কিন্তু হঠাৎই সে বেলতলায় হাজির হয়েছিলেন এক সাধু। তাকে ভগবান শিব স্বপ্নে বলেছেন, এই বেলতলায় মাটির নিচে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। সাধু যেন তাকে মাটি খুঁড়ে বের করে এনে এখানে তার মন্দির স্থাপন করেন। তাই সাধু সারারাত ধরে মাটি খুঁড়ে পেয়েছেন শিব-লিঙ্গ। এখানেই তিনি শিবের আদেশানুসারে স্থাপন করবেন বিগ্রহ। গ্রামের ভীড় জমতে সময় নেয় নি। সবাই এসেছে শিবলিঙ্গে দুধ দিতে। সাধু তার সিঁদুর লেপা ত্রিশুল হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মতন লাল। লম্বা জটা। কাঁচাপাকা দাড়ি।

দুধের সাথে চাল ও ফলের নৈবেদ্য। বেলগাছের তলাটা সতীনাথ বাবুই চুন সুড়কি দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। গাছের তলায় শিবলিঙ্গ মন্দিরের পাশেই গড়ে উঠল সাধুর একচালা ঘর। বেলতলা শিব মন্দির।

সাধুর নাম কেউ জানত না। সে বাঙালি না পশ্চিম দেশীয় সে পরিচয়ও বোঝা যেত না। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় পশ্চিমী টান। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, সাধু সন্ন্যাসীর নাম থাকতে নেই।

প্রথম প্রথম সাধুকে ঘিরে বেশ কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল। মাঝে মধ্যেই কেউ খবর আনত সাধু নাকি কট্টর বিপ্লবী। অন্ধের জেল ভেঙ্গে এখানে এসে সাধু হয়ে গেছে। কেউ খবর আনত সাধু বাঙালি। হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে তপস্যা করে শিবের আদেশে এখানে মন্দির স্থাপন করেছে। এই আলোচনা একদিন এমনিতেই থিতিয়ে এসেছিল। গ্রামের জীবন প্রবাহে বেলতলা আর বেলতলা মন্দিরে এক স্বাভাবিক যাত্রী বলেই চিহ্নিত হয়ে গেল।

দিনের বেলায় স্বাভাবিক থাকলেও সূর্য ডোবার পর ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত সাধু। তাতে অবশ্য গ্রামের জীবনে মন্দের থেকে ভালোই হতো। রক্তচক্ষু আর নেশাতুর দৃষ্টি শিবের ভর বলেই চিহ্নিত হতো। শিবের প্রসাদ পেতে সন্ধ্যার পর নিয়মিত কিছু সদস্যদের আনাগোনাও হতো

জীবন তরঙ্গে প্রকৃতির ভ্রূকুটি কোনোদিন বর্ষিত হবে না—এ আশা ঠিক নয়। মানুষ তা জানে বলেই প্রকৃতি ও নিয়তিকে আত্মীয় করে ঘর বাঁধে। সুখে হাসে দুঃখে কাঁদে। আবার হাসি-কান্নাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জীবনের জোয়ালকে টেনে চলে।

প্রকৃতি যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে বুলবুল চণ্ডির প্রবীনদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতেও তার কোনো চিহ্ন ছিল না। যে ট্যাঙ্গন বাধ্য কিশোরীর মতন গ্রামের বুকে কুল কুল সুরে বয়ে চলেছে, বর্ষার জলে যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে চাইলেও কোনোদিন বিদ্রোহিনী মূর্তিতে হাজির হয়নি সেই ট্যাঙ্গনই যে তার বুকের ভিতর এত রাগ তিল তিল করে পুষে রেখেছিল তার বিন্দুমাত্র আভাষ বুলবুল চণ্ডির মানুষেরা খুঁজে পায় নি।

একনাগাড়ে বৃষ্টি। ট্যাঙ্গনের জল বাড়ছিল। কিন্তু সে তো এই গ্রামের মেয়ে। কত ভালোবাসা তাকে নিয়ে। তার বুকে দাপাদাপি—আনন্দ কল্লোল। নির্জন দুপুরে গ্রামের বৌ-মেয়েদের উদাম গায়ের শীতল আবরণ। সুখ দুঃখ, পরনিন্দা কুচক্রী শাশুড়ী আর দজ্জাল বৌ-এর আলাপ কুঞ্জ। পুরুষের হাতে নৌকার বৈঠা আর জাল টানার নিপুন ধৈর্য—সব কিছুতেই এই ট্যাঙ্গনের নীরব প্রশয়।

বৃষ্টির জল ট্যাঙ্গনের বুকের উপর দিয়েই গড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুষ্টু মেয়ের মতন এদিক ওদিক ছুটে গিয়ে সাজানো ঘর যে লণ্ডভণ্ড করে না তা নয়, তবে ঘরের মেয়ের এই দুষ্টুমি বুলবুল চণ্ডির মানুষের কাছে কোনোদিনই তাণ্ডব বলে মনে হয়নি। বরং এই গ্রামের মানুষেরা ট্যাঙ্গনের এই উচ্ছল যৌবনের জন্য অপেক্ষা করত। কারণ যৌবন মানেই তো সৃষ্টি। যৌবনের উন্মাদনার পরেই আসে অমৃতের কুঁড়ি। বুলবুল চণ্ডির মাঠে জমে পলি। বাতাসে তোলে সবুজ ঢেউ-এ হলুদ শীষের হিল্লোল।

ট্যাঙ্গন রাক্ষুসী। ট্যাঙ্গন বিধ্বংসী—একথা কারো মনে হয়নি। ট্যাঙ্গন শুধু দিতে জানে, মানুষ শুধু পেয়ে থাকে এটাই তো এতদিনের বিশ্বাস। মানুষের অবিচার ও অত্যাচারের বিষ জ্বালা সইবারও যে একটা সহ্য সীমা আছে এ ধারণাটাই যে মনের কোনে জায়গা পায় নি।

অহমিকাকে তাও সহ্য করা যায়। কিন্তু সেই অহমিকা যদি হয় স্বার্থ সর্বস্বের অহমিকা তবে তাকে সহ্য করা কঠিন। বুলবুল চণ্ডির মানুষেরা ট্যাঙ্গনকে যখন মাটির বাঁধে বেঁধে ফেলেছি বলে অহমিকার দর্পে ট্যাঙ্গনের বুকে দাপাদাপি করেছিল তখনও ট্যাঙ্গন অবোধ মানুষ বলে তাকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু তার বুক নিংড়ে শুধু টেনে নেওয়ার স্বার্থপরতা—ট্যাঙ্গন যে মেনে নিতে পারেনি তারই প্রমাণ মিলল শ্রাবণের মিশকালো রাত্রে।

কী আক্রোশই না স্তরে স্তরে জমা ছিল ট্যাঙ্গনের বুকে। মাটির বাঁধ মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল ট্যাঙ্গনের স্রোতে। প্রকৃতির সাথে প্রকৃতিরই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। নিচে ট্যাঙ্গনের স্রোত ওপরে প্রবল হাওয়া—বরুন ও পবন দেবতা সেই রাতে একযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। খড়কুটোর মতন ভেসে গিয়েছিল গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলো, গবাদি পশু ও মানুষের মৃতদেহের স্তূপ ধ্বংসের সাক্ষী রূপে খোলা আকাশের তলে পড়েছিল। সেই বটতলার বটগাছটিকে কে যেন সযত্নে মাটি থেকে উপড়ে নিয়েছিল। কোথাও তার চিহ্ন নেই। সেই সাথে মন্দির ও সাধুর ঘরেরও কেউ কোনো খোঁজ পায়নি। যুক্তিবাদীরা এখানে প্রবল ঘূর্ণী জোয়ারকে-এর কারণ বললেও সেদিন গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ছিল ভগবান শিব যেমন স্বপ্নে আদেশ দিয়ে এখানে বাস করতে এসেছিলেন, তেমনি ভোলানাথ যাবার সময় প্রলয় নৃত্যের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে সময়ের পলির তলায় তার দুঃখ চাপা পড়ে যায়। তার উপর জন্ম নেয় বর্তমানের ফসল, ভবিষ্যতের সবুজ পত্র। বুলবুল চণ্ডির সেই ভয়াবহ রাত্রির সবহারানোর দুঃখের উপর সময়ের পলির আবরণে আবার ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছিল বুলবুল চণ্ডির জীবন। ট্যাঙ্গন আবার সেই বিনম্র কিশোরীর মতন এখানকার মানুষের ভিড়ে বয়ে চলেছে। বটগাছ নেই। বটতলা নামটি বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

[২]

বাড়ি থেকে একটা রিকশা নিয়েই বেরিয়েছিল বসুন্ধরা। বেলতলায় আসতেই রিকশাকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই রাস্তা, সেই বাড়িঘর, সেই গাছপালা। সবকিছুতেই তার চেনা স্পর্শ।